ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচন ও প্রসঙ্গ কথা

অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী

...হয়ে যায়। এই সেদিন আমরা দেখলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলেশিয়া অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৭তম এবং সার্ক অঞ্চলে ১ম স্থানে রয়েছে। এর আগে আমাদের অবস্থান ছিল ৪৪তম। তবে দু'বছর আগে এর পাতা খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। দিন কয়েক আগে খবর ছিল বন্দুকযুদ্ধের এবং তৎপরবর্তী কয়েক ছাত্রের তাৎক্ষণিক বহিষ্কারের; তবে প্রতিদিনই ছোটখাটো খবর থাকছেই। এই পরিবারে প্রত্যক্ষ সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার আর পরোক্ষভাবে সারা দেশ। কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সারা দেশের এখনও প্রতিচ্ছবি।

অতিসম্প্রতি আবারও প্রাধান্য সহকারে সংবাদপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিরোনাম হয়েছে। এবারের শিরোনামের কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্লামেন্ট নামে পরিচিত সিনেটে সদস্য সংখ্যা ১০৪। তন্মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি ৩৫ ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি ২৫ জন যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনারত শিক্ষক ও সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ভোটে নির্বাচিত হন। বাকিরা বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে মনোনীত হন। অনেক সময় এ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক ধারার ব্যারোমিটার হিসাবেই বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৫ সালের সিনেট নির্বাচনের কথা বলা যায়। সে বছর বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ২৫ জনের প্যানেলের ২৫ জন নির্বাচিত হয়। এ নির্বাচনের পরই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকারী দলটির ক্ষমতায় পুনর্প্রত্যাবর্তন অনেকটা সময়ের ব্যাপার বলে আলোচিত হতে থাকে। ১৯৯৫ সালের পর চার বছরের মাথায় পুনরায় নির্বাচন হচ্ছে। এ নির্বাচন হচ্ছে সর্বসাকুল্যে ৩৭টি কেন্দ্রে এবং ৬ জুন শুরু হয়ে বিরতিসহ ১৬ জুন নির্বাচন শেষ হবে। এবারের ভোটার সংখ্যা গতবারের তুলনায় প্রায় ৫ হাজার বেশি। প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ ও ব্যক্তি এবারে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত করেছে। অনেকের ধারণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট মাত্রই এ নির্বাচনে ভোটার হওয়া যাবে। আসলে ব্যাপারটি তা নয়। এ নির্বাচনে ভোট দিতে হলে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফী দিয়ে ভোটার তালিকাভুক্ত হতে হবে এবং তার পরই ছবিসংবলিত পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোট দিতে হয়। আসন্ন সিনিটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনটি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে সিনেটকে যে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে এখন মনে হচ্ছে, সিনেট তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবারের নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা ২৫০-২৫ জন করে একটি প্যানেল উপহার দিলে ৯টি প্যানেল হয়ে যেতে পারে। তবে শেষকালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুটো প্যানেলে এসে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। বর্তমান অবস্থায় কোন নিরপেক্ষ সদস্যের জয়ের সম্ভাবনা শূন্য। এ দুটো প্যানেলের একটি হচ্ছে পূর্বে উল্লিখিত বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশ্বাসী, চেতনা বাস্তবায়নে প্রত্যয়ী একটি প্যানেল এবং অপরটি হচ্ছে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ যার পিছনে বিএনপি ও জামায়াতের স্পষ্ট সমর্থন রয়েছে। প্রার্থীদের পরিচিতি থেকে তার আভাস সুস্পষ্ট। বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের অধিকাংশ আওয়ামী লীগ সদস্য না হলেও আওয়ামী বলয়ের অভ্যন্তরে বা কাছাকাছি অবস্থান করেন। এ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে রাজনৈতিক পরিচয় প্রচ্ছন্ন রেখে শ্রেণী, পেশা, গোষ্ঠীকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়, তবে বরাবরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ অধ্যাপকদের অংশীদারিত্ব বেশি থাকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উল্লিখিত দুটো প্যানেলের মধ্যে মর্যাদার লড়াইয়ের চেয়ে রাজনৈতিক লড়াইটা মুখ্য হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে উভয় প্যানেল তাদের প্রার্থী পরিচিতি সভা করেছে। সদস্য সংখ্যা দিয়ে পিছিয়ে থাকলেও বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্যানেল প্রচারণার দিক দিয়ে বেশ একটু এগিয়ে আছে। বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্যানেল পরিচিতির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সভাটি হয় জাতীয় প্রেসক্লাবে। বিএনপির শাসনামলের সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদ দখলকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই এ প্রতিনিধি পরিচিতি সভায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকলে সংবাদপত্রের বদৌলতে তাদের প্রার্থীদের পরিচিতি ও তাদের প্রার্থীদের কিছু বক্তব্য আমাদের নজরে এসেছে। একটি প্রথম শ্রেণীর বহুল প্রচারিত দৈনিক বিস্তারিত খবর পরিবেশন করেছে যাকে বক্তব্যের হুবহু প্রতিফলন বললে হয়ত তেমন ভুল হবে না। তাদের বক্তব্যে বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে; সিনেট নির্বাচনের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিপক্ষকে সরকারী দল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে অঙ্গীভূত করে তারা কিছু বক্তব্য দিয়েছে যা অন্তত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারী সচেতন মানুষের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কে কত গুরুতর অভিযোগ করেছে। তন্মধ্যে সন্ত্রাস, দলীয়করণ, চর দখলের ন্যায় হল দখলের কথা রয়েছে। পুলিশের ভূমিকাও সমালোচিত হয়েছে। সন্ত্রাস সম্পর্কে অধিক কথা বলা হয়েছে। প্রথমেই সন্ত্রাস নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা যায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের টেবিলটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ঃ

শিক্ষা বর্ষ	মোট সহিংস ঘটনা	গোলাগুলি ও বোমাবাজি	নিহত
১৯৯৩-৯৪	৫৭	২৭	০১
১৯৯৪-৯৫	৭২	৩২	০৪
১৯৯৫-৯৬	৭২	৫০	–
১৯৯৬-৯৭	৫৭	২৮	–
১৯৯৭-৯৮	৪৭	২৭	০১
১৯৯৮-৯৯ (৬ মাস)	১৪	০২	–

এ টেবিল থেকে স্পষ্ট যে, সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্মূল হয়ে যায়নি, পূর্বের তুলনায় অনেকটা কমেছে। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে নিরপেক্ষ যারাই অবস্থান করছেন তাঁরা জানেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাস দমনে ও সন্ত্রাসী নির্মূলে বহুলাংশে আন্তরিক। এ কারণে সন্ত্রাসীদের পরিচয় উপেক্ষা করেও তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদ ও ধরনের শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

তাৎক্ষণিকভাবে সন্ত্রাসী বলে রিপোর্টেড ছাত্রকে বহিষ্কার করার নজির এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে সরকারী নীতি এবং তা থেকে উত্থিত প্রশাসনিক দৃঢ়তার কারণে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম থেকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান ঘোষণা করেছেন। পূর্বেও হয়ত কোন কোন সেনা শাসক এমন অবস্থান ঘোষণা করেছিলেন। তবে সন্ত্রাসীদের নির্ভরযোগ্য স্থায়ী অভিভাবক বলে জ্ঞাত 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর' প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ছাড়াও দেশের সর্বত্র প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় উঠেছে। সন্ত্রাসীরা একবার মাথায় উঠলে মাথা খেয়ে বসে। তাদের প্রয়োজনে তারা দলবদল করে। এমনকি বর্তমানে হয়েছে তা কি প্রমাণ সাপেক্ষ তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যা রাতে অস্ত্র আসে না এবং শেষ রাতে অস্ত্র তার নিজের স্থানে চলে যায় না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাসীন উপাচার্য বা ক্ষমতালিপ্সু শক্তিশালী শিক্ষকের প্রত্যক্ষ মদদে সন্ত্রাস উৎসাহিত হয়েছে। জনৈক উপাচার্যকে মাথায় গোবর ঢেলে (শিক্ষকের পৃষ্ঠপোষকতায়) বিদায় করা হয়েছিল। যাঁকে তাঁর স্থানে বসানো হয়েছিল এ প্রক্রিয়ায় তাঁকেও সরানোর চেষ্টা হয়েছিল। ক্ষমতাসীন উপাচার্যের দৃঢ়তার কারণে এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সন্ত্রাসী তাণ্ডব অনেকটা কমেছিল। সেদিন স্বচক্ষে দেখেছি সন্ত্রাসীদের কোন দল নেই, তারা 'দিনে হয় ব্রহ্মচারী, রাতে গলাকাটা'। কিন্তু সে উপাচার্য ও কতিপয় সন্ত্রাসী শিক্ষকের তাণ্ডবে টিকতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ দেশের প্রথম শ্রেণীর একটি সংবাদপত্রে দেখেছিলাম। যখন উল্লিখিত উপাচার্যকে পদত্যাগে বাধ্য করা সম্ভব হলো না তখন এক বিশিষ্ট ছাত্রনেতাকে নির্মম হত্যার মাধ্যমে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করে উপাচার্যকে ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে অন্য উপাচার্য নিয়োগ করা হলো। এসব কথা হয়ত বলে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলার প্রয়োজন হতো না যদি না সে উপাচার্যগণই এখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে মাঠে না নামতেন।

ছাত্রী মিছিলে হামলার বিচার সম্পন্ন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস সম্পূর্ণ নির্মূল না হলেও সন্ত্রাসীরা মাথা তুলতে সাহস পেত না। কিন্তু নতুন উপাচার্য এসেই ৭০ সন্ত্রাসীকে কৌশলে রেহাই দিয়ে পুনর্বাসিত করলেন। কিছুদিনের মধ্যে ঘটনার পটপরিবর্তনের পর তিনি প্রভু পরিবর্তন করলেন। তবুও বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি। তার পর যিনি উপাচার্য হয়ে এলেন তাঁর আমলে সন্ত্রাস মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেল, স্বজনপ্রীতির রেকর্ড ভাঙ্গা হলো, দলীয়করণ কত প্রকার তা সবাই জানলেন। দুর্নীতির জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন ঠিকই, কিন্তু উপাচার্যের পদ চলে যাবার পরও অতিকৌশলে কদর্য দুর্নীতির চিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরার পথে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন। সুদীর্ঘ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস না নিয়েও বেতন-ভাতা গ্রহণ করলেন। তাঁর আমলেই এক শিক্ষক পায়ে গুলিবিদ্ধ হলেন, অপর শিক্ষকের কক্ষ তছনছ হলো এবং তাঁর সামনেই এক শিক্ষকের বুকে সন্ত্রাসীরা পিস্তল চেপে ধরল। এরাই যখন নির্বাচনী প্রচারণায় এসেই সন্ত্রাস-দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন তখন দেশবাসীর মনে 'ভূতের মুখে রাম রাম' জাতীয় প্রবাদটির কথা মনে পড়ে যায়। এ 'মনীষী' সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য যে কমিটি হয়েছিল তার কার্যকারিতা আমলে নেননি। তাই বলে তাঁর প্রতিপক্ষ ধোয়া তুলসিপাতা তা বলব না। তবে একজনের সাথে অন্যের পার্থক্য হচ্ছে 'চুরি তো চুরি, আবার সিনা জুরি'। সে আমলের পত্রিকায় চর দখলের ন্যায় হল দখলের কত খবর যে সংবাদপত্রের পাতায় রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এখন হল মাঝে মাঝে সন্ত্রাসীদের দখলে চলে যায়, শিক্ষক কার্যক্রম সাময়িক বিঘ্নিত হয়; কিন্তু সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের সাথে সহ-অবস্থানের নজির অতীত ঘটনা। একালে স্বজনপ্রীতির কথা তেমন উচ্চারিত হয়নি। কেননা থু থু ফেললে নিজের গায়ে পড়বে বলে প্রতিপক্ষ তা করে না। দুর্নীতির কথাও তেমন বলা হচ্ছে না। কেননা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির যে রেকর্ড পূর্বতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সৃষ্টি করেছে তা হয়ত তাদের লজ্জিত ও ভীতিগ্রস্ত করে তোলে। তবে তারা দলীয়করণের কথা বলে। মুনতাসীর মামুন এক সময় দলীয়করণের বীভৎস রূপ দেখেই বর্তমান সরকারকে নির্দলীয়করণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অনেকেই শুনে বিস্মিত হবেন যে, তা সম্ভব হয়নি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার এই সেদিনও তদানীন্তন সরকারী দলে নিয়োজিত ছিলেন। সে আমলে নিয়োজিত প্রক্টর, আইন অফিসার, ছাত্র পরামর্শক কেন্দ্রের পরিচালক এখনও আছেন। নিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ নিয়োগ যথা প্রভোস্ট, হাউস টিউটর, সহকারী হাউস টিউটর বা সহকারী প্রক্টর নিয়োগে এ অবস্থা বিরাজ করত। আমি এক সময় সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ছিলাম, আমাকে একটি হাউস টিউটর কিংবা সহকারী হাউস টিউটর নিয়োগের অধিকার উপাচার্য দেননি। আমাকে হলের বাসা কোনদিন দেয়া হয়নি। অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে আমাকে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে মাত্র ১৬ মাসের মাথায় প্রভোস্টের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়। অথচ আমার কি দোষ ছিল তা বলা হয়নি।

বর্তমান উপাচার্যের কালে সলিমুল্লাহ, সূর্যসেন, রোকেয়া, জিয়াউর রহমান ও ফয়জুন্নেসা ছাত্রী নিবাসের প্রাধ্যক্ষ কারা ওয়ার্ডেন তা দেখলে এবং তাঁর সাথে ভূতপূর্ব উপাচার্যের কালের শুধুমাত্র জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে পাশাপাশি দাঁড় করালে দলীয়করণের বীভৎস রূপটি আবিষ্কার হবে। এ হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমানের খণ্ডচিত্র। ১৯৯৫ সালে সমমনা ২৫ সিনেট সদস্য নির্বাচিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, সন্ত্রাস, প্রশাসনিক অনিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে লাগাম ধরার প্রয়াস চালানো হয়। এসব প্রসঙ্গ নিয়ে সেদিনের সিনেট সদস্যরা কতবার যে ওয়াকআউট করেছেন তার হিসাব সংবাদপত্রের পাতায় রয়েছে। এসবের হোতাদের এবং আমাদের সম্মানিত গ্র্যাজুয়েটদের একটু কষ্ট করে সে সময়ের পত্রিকাগুলো দেখার অনুরোধ করছি। তৃপ্তির ঢেকুর গেলার অবকাশ নেই। বর্তমানে প্রশাসনের যে ব্যর্থতা নেই সে কথা অন্তত বিগত সিনেটে আমরা যারা ছিলাম তারা বলব না। এর মূল্যায়ন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, তবে নিজে মিষ্টি খেলে অন্যকে মিষ্টি না খাওয়ার উপদেশ দেয়া অন্তত ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা বাঞ্ছনীয় তা দেখা দরকার। আর এ প্রসঙ্গগুলো যখন নির্বাচনের সময় এত প্রকটভাবে আসে তখন তার ধীরস্থির মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়। সবচেয়ে মজা হচ্ছে যে, যারা এ সেদিনও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান-সদস্য ছিলেন তাঁরাও যদি দলীয়করণের কথা বলেন তাহলে কেমন শোনায়?

MAY 29 1999